অনুপ্রবেশ

বিনাযুদ্ধে ভারত দখল

শিবপ্রসাদ রায়

অনুপ্রবেশ
বিনাযুদ্ধে ভারত দখল

শিবপ্রসাদ রায়

৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

।। বিনা যুদ্ধে ভারত দখল।।

হ্যাঁ ভারত এবার বিনা যুদ্ধে বিজিত হচ্ছে খুব নগ্ন ভাষায় এটা লিখতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু ভারত একবার যদি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তার যে পরিণাম হবে তা অত্যন্ত মারাত্মক, বীভৎস এবং আরও নগ্ন। যা মুঘল আমলের ইতিহাসে এবং লীগ আমলের স্মৃতিতে বিদ্যামান। দৃশ্যমান বাংলাদেশে, পাকিস্তানে এবং ভারতের যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সংবাদপত্রে সবটুকু প্রকাশিত হলে সবাই বুঝতে পারতো আজ কাশ্মীর, আলিগড়, মোরাদাবাদ, মীরাট, মুর্শিদাবাদের প্রকৃত পরিস্থিতি কি? আসাম আজ কি অবস্থায়। সুতরাং স্থিতি আজ যেখানে পৌঁছে গেছে সেখানে চক্ষুলজ্জার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। ইতিহাসে বিদেশী শক্তির সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে। জয় পরাজয় হয়েছে। পরাজয় তখনই হয়েছে, যখন অতি ঔদার্যের মোহ কিম্বা ব্যক্তিগত মান অপমান বড় হয়ে উঠেছে। মহম্মদ ঘোরীকে বার বার পরাজিত করে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়ে গজনীতে ফেরত পাঠিয়েছেন পৃথ্বীরাজ। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী? ঠিক আজকের রাজনৈতিক চিত্র। ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন **দেখছি না**। জয়চাঁদ বিদেশী শক্তিকে সাহায্য করলেন শুধু ব্যক্তিগত অপমান বোধে। কপট ঔদার্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ আজ ভারতবর্ষকে এক ক্রশরোডের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন একটাই-ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টির নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবে, কিনা? ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যখন পাকিস্তানের জন্ম হল, তখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছিলেন ঃ ভারতে সাতশো বছর ধরে যে মুসলীম অভিযান তার প্রথম সফল বিজয়ী পদক্ষেপ হচ্ছে পাকিস্তান। লক্ষ্যণীয় প্রথম পদক্ষেপ শব্দটি। অর্থাৎ নাটকের প্রথম অঙ্ক। কিন্তু এতে কেউ গুরুত্ব দিলেন না। কারণ দুটি রাষ্ট্রের নেতার দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল ভিন্ন। ১৯৭৬ এ জিন্না বলেছিলেন, একবার যদি ভারত ভেঙে একটু পাকিস্তান বানাতে পারি তাহলে ভারতকে ধ্বংস করতে খুব বেশি দিন দেরী লাগবে না। ৪৭ এ পণ্ডিত নেহেরু

বল্লেন, পাকিস্তানের সমৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। ওরা ভারতকে ধ্বংস করবে, আর ভারত ওদের পুষ্টি সাধন করবে এই ছাগলাদ্য দৃষ্টিভজী কিন্তু তখনও এদেশে বিদ্যমান।

পাকিস্তান হাসিল করার পর জিন্না প্রকাশ্যেই বলেছিলেন ঃ পোকায় খাওয়া এই দু'টুকরো অংশের জন্য মুসলমানেরা পাকিস্তানের দাবীতে লড়াই করেনি। আমাদের লক্ষ্য দিল্লী জিন্নার ঘোষণায়, টঁয়েনবীর উক্তিতে কর্ণপাত করলেন না আমাদের নেতৃবৃন্দ। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হল এর জন্য বুকের মধ্যে কোনো ব্যথা নেই, বেদনা নেই। তারা তখন ব্যস্ত ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে। আর ব্যস্ত সমাজতন্ত্র হবে না সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা হবে তাই নিয়ে। একশো বছর ধরে হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের ফাঁপা বেলুনে মিথ্যে প্রচারের গ্যাস ঢুকিয়ে ফুলিয়ে যেটা দেখানো হচ্ছিল, জাতীয় নেতাদের গালে চড় মেরে সে বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে মুসলমানেরা-পাকিস্তান কায়েম করে। তা দিক। তা বলে আমরা তো ভণ্ডামী ছাড়তে পারি না। পাকিস্তান হোক না মুসলীম রাষ্ট্র। নেহেরু লিয়াকত চুক্তি অমান্য করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দিক না হিন্দুদের আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ থাকতেই হবে। বিশ্বমানবতা ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু মুসলীম ঐক্য, এইসব গালভরা অথচ অর্থহীন শব্দগুলো আমাদের নেতাদের মাথার মধ্যে তখন কোলাহল করছে। এই স্বরচিত কোলাহলে দেশের বাস্তব অবস্থা, দেশের ভবিষ্যৎ তাদের চোখে পড়ল না। বেশী কথা কি, আমাদের দেশের নেতারা বিশ্বাসই করতেন না পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। একটা শত্রুরাষ্ট্র তৈরি হল যার ভিত্তিই হচ্ছে ভারত বিদ্বেষ। যারা ঐটুকু পাকিস্তানে সন্তুষ্ট নয়। ঘোষণা করেছে আমাদের লক্ষ্য দিল্লী। যারা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছে, পাকিস্তানের জন্য লড়েছে তাদেরই একটা বড় অংশ রয়ে গেল ভারতে। আহাম্মুকেরাও এই সব ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। আমাদের নেতারা করলেন। জিন্নাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তিনি হিসাব করে দেখেছিলেন, সাতশো বছর ধরে মুসলমানেরা হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার করেছে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সৃষ্টি হবার পর হিন্দুদের যেভাবে

হত্যা, খুন এবং বিতাড়ন করা হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া স্বাধীন হিন্দুস্তানে হবেই। এই অপরাধ-বোধ থেকে আশঙ্কিত হয়ে তিনি বারবার নেহেরুকে অনুরোধ করেছিলেন, লোক বিনিময় করে নিন। মুসলমানদের এখানে পাঠিয়ে দিন। অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর, সিংহশিশু শ্যামাপ্রসাদ গর্জন করেছেন ঃ হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে, লোক বিনিময় করে হিন্দু মুসলমান সমস্যার চিরাস্থায়ী সমাধান করে নাও। জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতা তখন হিন্দু মুসলীম মিথ্যে ঐক্যের নেশায় বুঁদ। নেশার ঘোরে মনে মনে গাইছেন ঃ স্বপন যদি মধুর এমন হোক না মিছে কল্পনা, জাগিও না আমায় জাগিও না। তাই জিন্নার অনুরোধ সাভারকার এবং শ্যামা প্রসাদের পরামর্শ তাদের কানেই গেল না। তাদের জাগানো গেল না।

ভীত আশঙ্কিত জিন্না তখন নিশ্চিন্ত হয়ে পাকিস্তানে হিন্দুনিধন যজ্ঞ সুরু করলেন। জানিনা ভাররে হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা সত্যি সত্যি কাদের বংশজ। আধুনিক সমাজবিদ্যা স্বীকার করে একটা মানুষের ভাবনা চিন্তা আচার আচরণ হচ্ছে তার বংশধারা এবং পরিবেশের যোগফল। লক্ষ্য করা যায় মুসলিম অভিযানে হত্যা লুঠ মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে থাকে আর একটি বৈশিষ্ট্য। ব্যাপক নারীধর্ষণ। মধ্যযুগেও এটা দেখা গেছে। দেখা গেছে এই সেদিন বাংলাদেশেও ৭১ সালে দু'লক্ষ নারী গর্ভবতী হয়েছিল। ধর্ষিতা হয়েছিল কত লক্ষ কল্পনা করা যেতে পারে। এই পবিত্র কর্মের উদ্দেশ্য থাকে দুটি। একটি তাৎক্ষণিক অন্যটি সুদূর প্রসারী। আক্রান্ত জাতিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, দ্যাখো, মা বোনেদের মর্যাদা রক্ষার সামর্থ্য তোমাদের নেই। আত্মসমর্পণ করা এবং আত্মজাদের আমাদের সেবায় উৎসর্গ করাই তোমাদের ভবিতব্য। সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যটি হচ্ছে বর্তমানে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে হলেও আমাদের ঔরসজাত সন্তানেরা একদিন রক্তের ঋণ শোধ করবেই। ওপরে তাদের পরিচয় যাই হোক তারা হবে আমাদের উগ্র অন্দ সমর্থক। হিন্দু সমাজের ভেতরে থেকেই তারা হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করে দেবে। আগেই বলেছি চক্ষুলজ্জার সময় নেই। আমাদের দেশের রাজনৈতিক

নেতারা একান্তে নিজের মুখোমুখি হয়ে একবার নিজেদের আচরণগুলো যাচাই করেই দেখবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেলেন ঃ পৃথিবী থেকে হিন্দু জাতি এবং হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেলে মানবতা মনুষ্যত্বের উৎস মুখটাই শুকিয়ে যাবে। এই অমৃতময় হিন্দুত্বের ভিত্তিতে যারা ভারতবর্ষের সত্তর কোটি হিন্দুকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে তাদের সাম্প্রদায়িক বলার ধৃষ্টতার প্রেরণার উৎসটা কোথায়? আর যে ইসলাম সারা পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বইয়েছে, আজো বহাচ্ছে, ভারতবর্ষকে এই সেদিন যারা দু'টুরো করলো, বাকী ভারতটুকুও যারা নানাভাবে গ্রাস করতে চাইছে।

যাদের সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হয়ে লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে চিঠিতে লিখেছেন ঃ একটা ভাবনায় আমি ভীষণ পীড়িত। কথাটা আপনাকেও সাবধানে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। সেটা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। গত ছ'মাস ধরে আমি মুসলিম ইতিহাস এবং আইন পড়লাম। পড়ে আমার ধারণা হল হিন্দু মুসলমান মিলন শুধু অসম্ভব নয়, অসাধ্য। যে ইসলাম সম্পর্কে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন ঃ মসুলমানেরা শুধু লুঠ করেই ক্ষান্ত হয়নি-মন্দির ধ্বংস করেছে, প্রতিমা চূর্ণ করেছে, নারীর সতীত্বহানি করেছে। অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের ওপর যতখানি সম্ভব আঘাত এবং অপমান করেছে, কোথাও কোনো সংকোচ মানেনি। মনীষী এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর "বিশ্ব ইতিহাসের রূপরেখা" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইসলাম মানব সভ্যতার পক্ষে ক্যান্সার রোগের মতো সাংঘাতিক। গজনীতে মহম্মদ ঘোরী একটা মসজিদ তৈরি করেছিলেন যার সিঁড়িগুলোতে সেট করা আছে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া মন্দিরের পবিত্র বিগ্রহগুলো অর্থাৎ মসজিদের মূল চত্বরে পৌঁছবার আগে প্রত্যেকটি মুসলমান যাতে এই দেবদেবীগুলোকে পদদলিত করতে করতে যেতে পারে। পৃথিবীর একটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানও এসব ঘটনায় দুঃখিত নয়। এরপর শুধু একটাই প্রশ্ন, হে ভারতের উদার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই ইসলামকে অহেতুক অন্ধ সমর্থন করার কারণ শুধুমাত্র ভোট, বিশ্বাস হয় না। ভোট তো

হিন্দুদেরও আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট। রক্তের কোন গোমুখী উৎস থেকে উঠে আসে এই প্রেরণা, এ আত্মজিজ্ঞাসা আপনাদের একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতা পৃথিবীর সব দেশেই আছে। তাদের সকলেই এমন কিছু স্বার্থবুদ্ধি শূন্য নয়। কিন্তু এরকম রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী জাতিদ্রোহী রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষ ছাড়া দুনিয়ার কোথাও নেই। ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করলেন এই নেতারা, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় করলেন না। কারণ তাতে হিন্দুদের সুবিধে হয়ে যাবে, অসুবিধে হবে মুসলমানদের। ভারতে বেকার থাকবে না, অর্থনৈতিক চাপ থাকবে না, সাম্প্রদায়িক সমস্যা থাকবে না, পাকিস্তান আক্রমণ করলে তাদের সাহায্য করার লোক থাকবে না, এই সুস্থ স্বাভাবিক ভারতবর্ষ কি কল্পনা করা যায়? সুতরাং যা হবার তাই হতে থাকল। টয়েনবীর ইঙ্গিত এবং জিন্নার লক্ষ্য অনুযায়ী তারা কাজ করতে লাগলো। তাদের পরিকল্পনার দাবার ঘুঁটি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা এবং দলগুলো। পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ থেকে কোটি কোটি হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করে পাঠিয়ে দিল ভারতে। আমাদের নেতৃবৃন্দ কয়েক কোটি মুসলমানকে বিনীত অর্দ্ধচন্দ্রসহ পাঠিয়ে দিতে পারতেন পাকিস্তানে। তাতে একটা বাস্তব সমাধান হোত-নিজেদের প্রেরণায় পাঞ্জাব যেটা করে নিল। পাঞ্জাব আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ রাজ্য। সেখানে বেকার নেই, ভিখারী নেই। জায়গার অভাব নেই। এই সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের কারণ আর কিছুই নয়। বেসরকারীভাবে সফল লোক বিনিময়। পাঞ্জাব আজ মুসলমান শূন্য, তাই সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দেবার কেউ নেই। পাঞ্জাবের বিরাট পাকিস্তানী সীমান্ত থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ সেখানে কোনো সমস্যাই নয়। জৈল সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় *R.S.S.*-এর জেনারেল সেক্রেটারী রাজেন্দ্র সিংজীকে বলেছিলেন ঃ আমার প্রদেশের সীমান্ত হিন্দু পরিবেষ্টিত। একটি অনুপ্রবেশ ঘটলেও তা আমাদের চোখে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গ পাঞ্জাবের পথ অনুসরণ করলে, প্রবল জনসংখ্যার চাপে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকারী, অনুপ্রবেশ সমস্যা বলে কিছু থাকত না। আজ পাঞ্জাবে যে সমস্যা সেটা

অনুপ্রবেশঘটিত নয়, পাকিস্তান সোজাসুজি সেখানে হস্তক্ষেপ করেছে। তার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা পাঞ্জাবকে বিচ্ছিন্ন করা। শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে ধ্বংস করা। তার জন্য যা করা উচিত পাকিস্তান ঠিক তাই করে চলেছে। আজ আর পাঞ্জাবকে অনুপ্রবেশ শূন্য বলা যাবে না। শিখেদের একটি অংশ হিন্দুত্বচ্যুত হোয়ে পাকিস্তানের ক্রীড়নক রূপে কাজ করছে। তবু বাইরে নয় স্বর্ণমন্দিরে পর্য্যন্ত মুসলীম অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অপারেশন ব্লুষ্টারের পর বহু মৃতদেহ সনাক্ত হয়েছে মুসলমান বলে। এখনও খালিস্তানী এবং পাকিস্তানীরা নির্বিচারে হিন্দু হত্যা করে সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। রাজস্থানের সীমান্ত দিয়েও ঘটছে ব্যাপক অনুপ্রবেশ। খালিস্থানীদের সাহায্যের জন্য পাকিস্তানীরা কাশ্মীর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে পাঞ্জাবে ঢুকছে। সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আজ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব সীমান্ত সিল করলো না।

জেনারেল কারিয়াপ্পা একবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, প্রাক্তন সৈনিকদের সীমান্তে পাঁচ বিঘে করে জমি দেওয়া হোক। বিনাব্যয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের নেতারা এই বাস্তব সমাধানে কোন আগ্রহ দেখালেন না। কারণ তখনও তাঁরা মনে মনে গাইছেন ঃ জাগিও না, আমায় জাগিও না। আজ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পাঁচ মাইল কেন বহু জায়গায় দশ মাইল পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। ত্রিপুরা, আসাম এবং বিহার সীমান্তেও ঠিক একই চিত্র। ওপার থেকে লোক আসছে, থাকছে, ডাকাতি করে বাংলাদেশে পালিয়ে যাচ্ছে। এপারে ডাকাতি করছে, হিন্দুনারী হরণ করছে, আশ্রয় নিচ্ছে বাংলাদেশে। মালদহে, মুর্শিদাবাদে, ত্রিপুরায় এসব ঘটনা প্রত্যাহিক। নদীয়া, ২৪ পরগণাতেও। হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাববোধ করে করে জমি বাড়ি ফেলে চলে আসছে অন্যত্র অনুপ্রবেশকারীরা সেসব দখল করে পরমানন্দে বাস করছে। শিয়ালদহ বনগাঁ লাইনে ট্রেন থেকে বসে দেখা যায় বসতির পর বসতি বাংলাদেশী মুসলমানদের। এসব ঘটনা ঘটছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে। উদার অসাম্প্রদায়িক বামপন্থা প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গে, কারণ এসব অঞ্চলে সব দলের নেতাই মূসলমান।

যে বাংলাদেশ সামরিক শক্তিতে ভারতের একঘন্টার কামানের খোরাক নয় তার এতো উৎসাহ, সাহস এদের জন্য। বাংলাদেশ মনে করে বিনা যুদ্ধে আমরা ঢুকে যেতে পারি ভারতের দশ মাইল অভ্যন্তরে। আমাদের লুকিয়ে রাখার, পথ দেখানোর লোক আছে সীমান্তের দশ মাইল জুড়ে। এই সমস্যার উদ্ভবই হত না যদি আমরা, যারা পাকিস্তান চেয়েছিল তাদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। বাংলাদেশের দু'কোটি হিন্দুর জন্য স্থায়ী দুশ্চিন্তা থাকতো না, যদি তাদের ভারতে নিয়ে আসতাম অর্থাৎ যদি লোক বিনিময় করতাম। বেশ, লোক বিনিময় যখন হলো না, তখন পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি বিতাড়িত হিন্দুর জন্য আমাদের নেতারা জমি চাইতে পারতেন। দেশটা ভাগ হয়েছিল জমি দিয়েছিলাম ৩০ ভাগ। চুক্তির পর চুক্তি ভঙ্গ করে নির্মমভাবে যে কোটি কোটি হিন্দুকে পাঠিয়ে দিল পাকিস্তান, তাদের সম্পত্তি এবং জমি ফেরত দেবে না কেন? পাঞ্জাব মুসলমানদের পাঠিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানে, জমির দখল নিয়েছে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার কি হবে? পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে দু'কোটি হিন্দুকে তাড়ানো হয়েছে। তাদের জমি দেওয়া হবে না কেন? এ দাবী অত্যন্ত ন্যায্য দাবী। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য ভারত সংলগ্ন বাংলাদেশের অন্ততঃ ছটি জেলা দাবী করা উচিত। যশোর, খুলনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, বরিশাল এবং ফরিদপুর। যে উৎসাহ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াচ্ছে তারা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের ন্যায্য অধিকারের পাশে নিশ্চয়ই দাঁড়াবে। কারণ এই অধিকার এই দাবী ন্যায়তঃ ধর্মতঃ এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এতে বাংলাদেশ দুর্বল হবে। বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা বাড়বে। ওই ছটি জেলাকে হিন্দু জেলা করে দিলে মুসলিম অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা যাবে। এগুলো আমরা সহজে করতে পারতাম ৭১ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সাহায্যের সর্ত্ত হিসাবে। পরিনি। কারণ আমাদের নেতাদের বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃতপুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। যেমন এখন সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করা উচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনীকে।

এগুলো কোনো অসম্ভব অস্বাভাবিক কথা নয়। মুসলমানদের কাছ থেছেই এগুলো শিখতে হবে। পৃথিবীর কোনো মুসলমান দেশে অমুসলমানেরা সম্মানের সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে বাস করতে পারে না। বাংলাদেশে দু'কোটি হিন্দু থাকা সত্ত্বেও সেখানে একটি হিন্দু চৌকিদার পাওয়া যায় না কাশ্মীরে শতকরা ত্রিশজন হিন্দু অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও সেখানে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হবে, এক কল্পনা করা যায় না। এখন ভারতের কোনো খেলোয়াড় দল কাশ্মীরে গিয়ে মার না খেয়ে ফিরে আসতে পারবে কিনা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। ভারতের মধ্যে থেকেও কাশ্মীরের মুসলিম চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে, আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলীম চরিত্র বজায় রাখা হচ্ছে। কেরালার মল্লাপুরম জেলাকে মুসলীম জেলা করা হয়েছে। রাষ্ট্ররক্ষার প্রয়োজনে হিন্দুরা সীমান্তের জেলাগুলোকে হিন্দু জেলা করতে পারবে না কেন? বিকৃত বংশগতির রাষ্ট্রদ্রোহী নেতৃত্ব রয়েছে বলে না উদার সহিষ্ণু ক্ষমাসুন্দর হিন্দু সমাজে কোনো উগ্র সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী নেই বলে? পৃথিবীতে কিছুই থাকে না। সবই কোনো ক্রিয়ার সমতুল বিপরীত প্রতিক্রিয়ারূপে সৃষ্টি হয়। কারণ এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ভারতবর্ষে বি, এল, ও,-র জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশ লিবারেশন অর্গানাইজেশন। সারাদেশের জনসমর্থন সৃষ্টি হচ্ছে এর পিছনে। বি, এল, ও,-র প্রতিনিধিরা দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। নির্জোট সম্মেলনের নেতাদের কাছেও বি, এল, ও, তাদের দাবী পত্র পেশ করেছেন। আর একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে ''বঙ্গসেনা'। এরা আন্দোলন চালাচ্ছে স্বাধীন বঙ্গভূমির জন্য। বি, এল, ও এবং বঙ্গসেনা পরিচালিত আন্দোলন আছড়ে পড়ছে বাংলাদেশ সীমান্তে। সীমান্তের ওপারেও। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে। সারাদেশের দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে এদিকে। সরকার মদত না দিলেও প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছে। উচিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সরকারী সাহায্য দেওয়া। এই ন্যায্য দাবীর পিছনে বিপুল জনসমর্থন চাই। এদের দাবী জমি চাই। বঙ্গসেনা এবং পি, এল, ও-র দাবী যদি আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহানুভূতি সংগ্রহে সক্ষম

হয় দশলক্ষ মানুষের জন্য-তাহলে দু'কোটি মানুষের দাবী উপেক্ষিত হবে কোন যুক্তিতে? কিন্তু এই ঐতিহাসিক দাবীর পাশে এসে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। ভারতের ক্রীতদাস রক্তের প্রতিভূ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। অন্ধ আত্মসমর্পণ আর যুক্তিহীন তোষণে অভ্যস্ত এই শিখণ্ডী নেতাদের দেখেই রাষ্ট্রদ্রোহীদের উৎসাহ সীমাহীন হয়ে উঠেছে। ব্যাপক অনুপ্রবেশে বিশৃঙ্খল করতে চাইছে জনজীবুন। বিনাযুদ্ধে দখল করতে চাইছে ভারতবর্ষ। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার করতে চাইছে হিন্দুস্তানকে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার খুব ভালো করেই জানেন, ৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ভারতের মুসলীম জনসংখ্যা আট কোটি কুড়ি লক্ষ। কিন্তু তিনি বিভিন্ন জনসভায় বলে থাকেন, ভারতে এখন চৌদ্দ কোটি মুসলমান। দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে এই মিথ্যা কথা তিনি কেন বলেন? বলেন এটি একটি চক্রান্তের অংশ বলে। সে চক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের যাতে এই সংখ্যার মধ্যে মিলিয়ে নেওয়া যায়। এটাকে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বলছি এই কারণে, পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশ তাদের জনগণনায় দু'কোটি জনসংখ্যা ইচ্ছে করে কম দেখিয়েছে। একটি দেশ অকারণে তাদের জনসংখ্যা কম করে দেখাবে কেন? দেখাবে, কারণ এইসব টুকরো টুকরো দৃশ্য একটি গোটা নাটকের অংশ মাত্র। যে নাটক রচিত হয়েছে ৯৮০ সালে। ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে লণ্ডনে বসে। ধর্মান্তর অনুপ্রবেশ আর জন্মহার বৃদ্ধি করে এই শতাব্দীর মধ্যে ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এই নাটকের আরেকটি চরিত্র হচ্ছে ফারুক আবদুল্লা। তিনি অনুপ্রবেশকে আইনসিদ্ধ করতে চাইছেন পূনর্বাসন বিল পাশ করে। বিনা বাধায় যাতে পাকিস্তানীরা ভারতে এসে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। এই অনুপ্রবেশ আজ ভারতবর্ষের জনজীবনকে অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। অনুপ্রবেশের মূল উদ্দেশ্য আসামে আংশিক সফল হওয়ায় মুসলমানদের উগ্রতা অস্থিরতা সাম্প্রদায়িক প্রবণতা তীব্র হয়েছে। এ শুধু আমাদের কথা নয় সরকার নিয়োজিত তদন্ত কমিটিই স্বীকার করেছে, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী

উগ্রপন্থী মুসলমানেরা। এ সংবাদ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাদের এতো দুঃসাহস যে তারা সর্বত্র পুলিশ মিলিটারীকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। দিল্লীতে, আমেদাবাদে, মীরাটে যে দাঙ্গা হয়েছিল, একে দাঙ্গা বলা চলে না। এ ছিল পুলিশের প্রতি মুসলমানদের সোজাসুজি আক্রমণ। কর্ণাটকে ডেকান হেরাল্ডে মহম্মদের নামে গল্প ছাপা নিয়েও ছিল পুলিশকে আক্রমণ। মীরাটে, দিল্লীতে বাংলাদেশী পাকিস্তানী মুসলমান ধরা পড়েছে। তাই অনুপ্রবেশের বিপদ শুধু সামাজিক অর্থনৈতিক নয়। জাতীয় বিপদ। ভারতের প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র, সরকারের, ইন্‌টেলিজেন্সী বিভাগ জানাচ্ছে ব্যাপক অনুপ্রবেশের সংবাদ। কোনো মুসলিম নেতা এতে কর্ণপাতই করছেন না। ফারুক আবদুল্লা কলকাতায় এসে বলে গেলেন, অনুপ্রবেশ। বাজে কথা। মুসলমানদের মুখপত্র ''আখরার এ মশরিক'' অভিযোগ এনেছে ''আনন্দাবাজার'' ''স্টেটস্‌ম্যান'' ''আজকাল'', ''যুগান্তর''-এর বিরুদ্ধে, তাদের অভিযোগ অনুপ্রবেশের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এই পত্রিকাগুলো। বিচিত্র আমাদের দেশের বিভ্রান্ত সাংবাদিক, বুদ্ধি জীবী এবং ক্রীতদাস রক্তের উত্তরসুরী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। আসামের ব্যাপারে এরা সব সময় বলে এসেছেন, আসামের সমস্যা জটিল এবং অর্থনৈতিক। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় কত যুক্তিজাল। আসামের মূল সমস্যা অনুপ্রবেশ, এই ঘটনাকে আড়াল করার কি অপচেষ্টা। আজ অনুপ্রবেশের ব্যাপকতা দেখে নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁরা সত্য উচ্চারণ করে ফেলছেন। বলছেন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার আর একটা আসাম হয়ে উঠবে। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা চিরকাল পরিচালিত বাস্তবতাবর্জিত ভিত্তিহীন আবেগে। আর রাজনৈতিক নেতারা নিয়ন্ত্রিত হন, ইউটোপিয়ান আইডিয়া এবং নির্ভেজাল ব্যক্তি স্বার্থে। তাই আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতারা পাগল এবং স্বার্থান্বেষীর কম্পাউণ্ড। অনেকেরই মনে পড়বে একাত্তরের বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ভারতের শতকরা একশোজন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন, পাকিস্তানের যাবতীয় সমৃদ্ধির রুট হচ্ছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কব্জা থেকে

বাংলাদেশ চলে গেলে পাকিস্তান ছ'মাস টিকবে না। অর্থনৈতিক নাভিশ্বাস উঠে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল পাকিস্তানের কিছু হয়নি। নাভিশ্বাস উঠে গেল বাংলাদেশের। এই হচ্ছে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতাদের জ্ঞানগম্যি এবং দূরদর্শিতা। সুতরাং অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা এবং এর চরম পরিণতি বুঝতে দেরী হওয়া এদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ এরা ঠিক বাস্তব ভারতবর্ষে বাস করেন না। এদের মানসিক অবস্থান ধর্মনিরপেক্ষতার তুরীয় জগতে। অসাম্প্রদায়িকতার গন্ধর্বলোকে। বিশ্বমানবতার স্বপ্নলোকে। যা পৃথিবীতে নেই, হয়নি হবে না, তার জন্য এদের কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

আর যেটা হতে পারে হওয়া একান্ত দরকার। চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্যও সেটা অবশ্য প্রয়োজনীয়; সেই সত্তর কোটি হিন্দুর ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রূপ, বলিষ্ঠ হিন্দু সংগঠন এদের কাছে দিনের দুঃস্বপ্ন, রাতের বিভীষিকা। আনন্দের কথা দেরীতে হলেও এদের মোহভঙ্গ হচ্ছে। মুসলমানদের ক্রমবর্দ্ধামান আগ্রাসী আচরণই মোহ ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। খুব সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা জাগরণ ঘটছে। সীমান্তে অঞ্চল, মছলন্দপুর, বনগাঁ। অঞ্চলের হিন্দু জনসাধারণ এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বহু মুসলমানকে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। সংবাদপত্র যোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। অনুপ্রবেশ সম্পর্কে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে, সাধারণ মানুষ সরব হয়ে উটেছে। যারা জাতীয়তাবাদী প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানপন্থী নন, তাঁরাও সোচ্চার হয়ে উঠছেন। বরুণ সেনগুপ্ত এবং তাঁর পত্রিকা বর্তমান অনুপ্রবেশ বিষয়ে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনুপ্রবেশের জেলাওয়ারী বিপদ এবং পরিসংখ্যান দিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। বলেছেন এতো বড়ো বিপদে এরা যেন কেউ গুরুত্বই দিচ্ছেন না। বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করছেন। কিছু সাম্প্রদায়িক লোক উস্কানি দিয়ে ওপার থেকে লোক নিয়ে আসছে। অনুপ্রবেশ নিয়ে সোচ্চার হওয়ার ফলে ২৪ পরগণার এক মুসলীম যুবক এসে তাঁকে বলেছিল আপনারা অনুপ্রবেশ

অনুপ্রবেশ করে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছেন কেন? শ্রীসেনগুপ্ত তাকে বলেন সাম্প্রদায়িকতা ছড়াইনি। আপনাদের ভালোর জন্যই লিখছি। কিছু মুসলমান নতুন নতুন মসজিদ তৈরি করে দিয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে গোটা মুসলমান সমাজকে বিপদে ফেলে দেবে। কারণ হিন্দুরা যে যাই বলুক, দেশ ভাগ কি জন্য হয়েছিল, কারা দেশ ভাগ করেছিল কেউ ভোলেনি। এই নিষ্ঠুর সত্য কথাগুলি সাংবাদিকেরা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে ন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে। জনগণও পিছিয়ে থাকেননি বিদ্যার্থী পষিদের অহ্বানে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে পূর্বাঞ্চল অনুপ্রদেশবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি খান্না, প্রাক্তন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, সংসদ সদস্য শ্রীরাম জেঠমালানী, স্বামী অগ্নিবেশ উপস্থিত ছিলেন। আসামের ছাত্র নেতারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা জানালেন, তাদের রাজ্যের অনুপ্রবেশের সমস্যা। ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে অনুপ্রবেশ তো দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছেই। এখন গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর সীমান্তেও অনুপ্রবেশকারীদের অবারিতদ্বার। সুপরিকল্পিত অনুপ্রবেশ এখন ভারতের অন্যতম ভয়াবহ সমস্যা। এই সমস্যার স্রষ্টা এবং পালক রাজনৈতিক দলগুলি। নিশ্চিত ভোট ব্যাংক মনে করেতারা এদের রেশনকার্ড করে দেয়, ভোটার লিষ্টে নাম তুলে দেয়। স্থায়ী নাগরিক হয়ে যায়। তারা নির্বাচনে দাঁড়ায় অঞ্চল প্রধান হয়। আরও অনুপ্রবেশকারী আনবার একটি নিশ্চিত ঘাঁটি তৈরি হয়ে যায়। এদেশের বুদ্ধিজীবীদের আরো একটি সমস্যা অনুপ্রবেশকারী বলতে এরা হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষকেই বোঝেন। শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য এরা বুঝতে পারেন না। বাংলাদেশ থেকে হিন্দু আসে লাঞ্ছিত অত্যাচারিত হয়ে টিকতে না পেরে। মুসলমান আসে এই দেশটাকেও মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ করবে বলে। দুই এক হয়ে গেল! সাংবাদিক এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই সিরিয়াস বিষয়টি লঘু করে দেন, ওখানে জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপ অসম্ভব দারিদ্র্য তাই মুসলমানরা চলে আসছে। হতভাগ্য হিন্দু কোনোদিন কোরাণ পড়ে জানবার চেষ্টা করলো না। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীটা কি।

কেন তারা দলে দলে আসছে? বিদেশের টাকা এদেশের মৌলবাদীদের সাহায্য তারা না চাইতে পায় কেন? সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা চায় ভারতকে কোফেরীয়ানার দোজখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত করত। ইরানের সমস্ত অন্যায়কে এদেশের সরকার সমর্থন করেছে। সব দেশের আগে স্যাটানিক ভার্সেস বে আইনী ঘোষণা করে ইরানের প্রিয় হতে চেয়েছে। খোমেনী মারা গেলে সবরকম নিয়মকানুন উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছে। খোমেনি ধর্মীয় প্রধান ছিলেন, রাষ্ট্রপ্রধান নয়। এতো নতজানু হয়ে সাম্প্রদায়িক পারসী নাগরা বারবার চুম্বন করে, গোটা ভারতের মান মর্য্যাদা লুণ্ঠিত করে কি সাফল্য অর্জিত হল? ইরান আজ কাশ্মীর প্রশ্নে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের সর্বপ্রকার সহযোগীতা করতে চায়। কাশ্মীরকে পৃথক করার জন্য পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে চায়। একথা তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। অনুপ্রবেশ একটি জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা তৈরি করার পিছনে আছে গ্লোবাল কনসপিরেসি। প্যানইসলামিক চক্রান্ত।

রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের স্বার্থে গদীর স্বার্থে এই জ্বলন্ত সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এই দেশ যাদের তারা নিশ্চুপ থাকতে পারে না। তাই ব্যারিষ্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছে সীমান্ত শান্তি ও সুরক্ষা সমিতি। যাদের কাজ এ বিষয়ে জনজাগৃতি এবং অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা সংগ্রহ করা। এদের সংগৃহীত তথ্যে প্রকাশ, শুধু পশ্চিমবঙ্গে বাহান্ন লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান এসেছে। পঞ্চাশটি বিধানসভার আসনকে এরা নিয়ন্ত্রণ করবে। একশো পঞ্চাশটি বিধানসভাকে এর প্রভাবিত করবে। এই ভয়ংকর সংকটের মোকবিলা করতেই হবে। কিন্তু এতো বড়ো বিপদ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সোচ্চার শুধু ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্যান্য রাজনৈতিক দল নীরব দর্শক এবং সমর্থক। তাতে কিছু যায় আসে না। সাধারণ মানুষ জাগ্রত হচ্ছেন, সচেতন হচ্ছেন, প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠছেন। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষ্মণ। সুস্থতার লক্ষণ। কারণ এদেশের ইতিহাসে দেখা যায়, দেশের শ্রেষ্ট

মানুষদেরই একটা বড়ো অংশ সর্বকালে রাষ্ট্রের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলায়। অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে। ভীষ্ম, দ্রোণ, জরাসন্ধ, কংস, জয়চাঁদ, অম্ভী, মানসিং, মীরজাফর কেউ সাধারণ স্তরের লোক ছিলেন না। সম্মানিত রাজপুরুষ ছিলেন। এদের পরিণতি ছিল অত্যন্ত করুণ। ভীষ্ম, দ্রোণ সৎলোক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মরতে হলো। শুধু অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন বলে। মরতে হলো মূল শত্রু দুর্যোধনের অনেক আগেই। জয়চাঁদ, অম্ভী, মানসিংদের পরিণামও খুব ভালো হয়নি। ইতিহাসে ঘৃণিত চরিত্ররূপেই তাঁরা চিহ্নিত। এইসব ঘটনাগুলো থেকে হিন্দুবিরোধী হিন্দুনেতাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। বুদ্ধিজীবী লেখক সাংবাদিকদেরও দেওয়ালের লিখন পড়ে ফেলা উচিত। তাঁরা এখনও দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি জনগনকে জানাতে চাইছেন না। দেশজুড়ে বিপুল হিন্দু গণঅভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে। এঁরা দেখেও না দেখার ভান করছেন। তাঁদের এটা লক্ষ্য করা উচিত রাষ্ট্রীয় অনৈক্য, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক নৈরাশ্য পীড়িত ভারতবর্ষে এক ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল হিন্দুশক্তির জাগরণ ঘটছে। যে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীর সঙ্গে কথা বল্লেই তার হতাশা উত্তেজনা অবসাদ অনুভব করা যায়। কোন দলের আর আত্মবিশ্বাস নেই। যেটুকু শক্তি আছে তা শুধু দলের অস্তিত্ব রক্ষা করতেই শেষ। হিন্দু সংগঠনের যে কোনো কর্মীর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায় কি দুর্জয় আত্মবিশ্বাস, কি বিপুল আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে তারা কাজ করে চলেছে। এই হিন্দু জাগরণ, প্রস্তুতি একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং ঐতিহাসিক নিয়তিও। এই সুশৃঙ্খল হিন্দু অভ্যুত্থানের পিছনে যে কুশলী নেতৃত্ব রয়েছে তাঁরা অত্যন্ত সংযত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তর্কাতীত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। তাই এই শক্তির কোন বিকৃত প্রকাশ নেই। বহিঃপ্রকাশ নেই। তবু এই শক্তি সব রাষ্ট্রদ্রোহীদের যে আতংকিত করে তুলেছে সে লক্ষণও বেশ প্রকট। ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল পরস্পর যুযুধান, কোনো ব্যাপারেই এরা একমত হতে পারে না। কিন্তু *R.S.S* .বিরোধিতায় এদের একটুও বিরোধ নেই। সকলে একমত। ইন্দিরা গান্ধী হরিদ্বারে বিশ্বহিন্দু পরিষদ নির্মিত ভারতমাতার

মন্দিরের উদ্বোধন করলে সি.পি. আইয়ের রাজ্যেশ্বর রাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেনঃ "ইন্দিরা গান্ধী এই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।" বিশ্বহিন্দু পরিষদ এখন বি[illegible]জনক গতিতে এগোচ্ছে। এই আতঙ্ক প্রমাণ দিচ্ছে হিন্দু সংগঠন ঠিক পথে এগোচ্ছে এবং এরাই পারবে দেশী বিদেশী চক্রান্তের মধ্যে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে। এই বিশ্বাস এখন দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছে হিন্দু সমাজের মধ্যে। তারই প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে। সব দলের নেতারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মসুলীম নেতারা নিজের দলের প্রতি বিশেষ আস্থা রাখেন না। আস্থা রাখেন মুসলীম সংগঠনের ওপর। ফরোয়ার্ড ব্লকের কলিমুদ্দিন প্রতি মিটিংয়ে বলেন, আগে আমি মুসলমান, পরে ভারতীয়। মনসুর হবিবুল্লা মার্কসবাদী, অথচ চলে গেলেন সরকারী পয়সায় মক্কা। কট্টর মার্কসবাদী, হজ করে হাজী হয়ে এলেন। নেতাজীর সহকর্মী পরে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কংগ্রেস সেবাদলের প্রধান শাহনওয়াজ খান গ্রামে গঞ্জে মুসলীম সম্মেলন করে বেড়ালেন। সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে বেড়ালেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। জেড্ এ আনসারী, মহসীনা কিদোয়াই কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকেও পুরোপুরি। সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। আনসারী মন্ত্রী হয়েও সুপ্রীম কোর্টের রায়, সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। শাহবনু মামলায়। শাহাবুদ্দিন জনতা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল গড়লেন ইনসাফ পার্টি। অন্য কোন দলে এখন জাষ্টিস নেই। ইনসাফ নেই। জনগণ কিন্তু সব হিসেবে রাখছে। তার প্রমাণ এবার নির্বাচনে এরা সবাই ধরাশায়ী। মনসুর সাহেব কলিমুদ্দিন মিঞাকে পার্টি আড়ালে সরিয়ে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছে। এদের দুঃসাহস কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ ১৯৮৫ সালের একটি ঘটনা।

মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের মুসলীম সদস্যরা একত্রিত হয়ে ফুটনানী হলে সিদ্ধান্ত নিলো শ্লোগান হিসাবে বন্দেমাতরম্ নিষিদ্ধ করতে হবে। নিষিদ্ধ না হলে তারা কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে মুসলীম কংগ্রেস করবে। শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী চাকুরী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে-এ দাবীও সেখানে তোলা

হয়। প্রত্যেকটি দলের হিন্দু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী মুসলমানদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। প্রত্যেকটি হিন্দু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে। কিছু নেতার তোষণ এবং ঔদাসীন্যকে গোটা জাতির ঔদাসীন্য ধরে নিয়ে মুসলমানেরা আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। জলপ্রবাহের মত অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায়, আসামে, বিহারে। সাংবাদিক হলধর পটল ডেলি রিপোর্টিংয়ে দেখিয়েছেন, কিভাবে অনুপ্রবেশকারী আসছে। আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পাচ্ছে। মুসলমান অনুপ্রবেশকারী কেমন ভাবে হিন্দু নাম নিয়ে বাস করছে। তার সাপ্তাহিত ফিচার "ময়না তদন্তে" তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলিও এই চক্রান্তে কিভাবে লিপ্ত। কতো সহজে টাকা দিয়ে স্কুল থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে পুরো রিপোর্ট আছে। সরকার সব জানে। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে দলগুলি নির্বিকার থাকতে চাইছে। হলধর পটলই একমাত্র সাংবাদিক যিনি শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন নি। হিন্দু পৃথিবীর যেখান থেকেই চলে আসুক বা পালিয়ে আসুক ভারতে সে শরণার্থী। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তো সরকারের প্রতিশ্রুতিই ছিল, ওখানে টিকতে না পারলে ভারতে হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে স্থান দেওয়া হবে। এখন হিন্দু আসছে প্রাণের দায়ে। মুসলমান আসছে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। যুগে যুগে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার বদল হয়। এখন অনুপ্রবেশ তাদের হাতিয়ার। তাদের সঙ্গে সে ভাবেই ট্রিট করা উচিত। অপ্রতিরোধ্য মনে হলে লোক বিনিময়ের দাবীকে সোচ্চার করতে হবে। হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হলে দুদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যাও থাকবে না। অনুপ্রবেশ সমস্যাও থাকবে না। আজকালের সাংবাদিক লিখছেনঃ শুধু বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে প্রত্যহ পাঁচশো করে বাংলাদেশী মুসলমান আসছে বহু বছর ধরে। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখছে ঃ হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী নদীয়ার কৃষ্ণনগরে একটা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলেছে। ষ্টেটস্‌ম্যান আরো লিখেছে ঃ যে হকাররা কলকাতায় আইন শৃঙ্খলা সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছে, এরা সবাই বাংলাদেশ থেকে আসা বিহারী মুসলমান। এরা সাহায্য

পায় খিদিরপুরের একজন প্রভাবশালী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতার। আনন্দবাজারে এস, পি, সাগর লিখলেন ঃ বিহারের বিষণগঞ্জে শতকরা ষাট থেকে পঁয়ষট্টি জন অধিবাসী বাংলাদেশী মুসলমান। বোমা বন্দুক নিয়ে তারা সাঁওতালদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহ লোপাট করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছে। এই দুঃসাহস প্রায় একটি দেশের রাষ্ট্রশক্তিকেই চ্যালেঞ্জ জানানো। এই দুঃসাহসের খুঁটি হচ্ছে স্থানীয় মুসলমান এবং কংগ্রেস-ই দলের বিহার শাখার সভাপতি জনাব রফিকুল আলম। তিনি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। এ সংবাদও আনন্দবাজারের। অর্থাৎ কংগ্রেস ফরওয়ার্ডব্লক যে যাই করুক, মুসলমানেরা তাদের ঠিক লাইনেই আছে। এসব কথায় যে কোন সন্দেহ নেই তার প্রমাণ প্রশ্রয়দাতারাই দিচ্ছেন। ১৯৪৮-র ১৪ই জানুয়ারীতে প্রকাশিত সংবাদ-ভারতের চারটি মুসলীম সংস্থত্রা দিল্লীতে জনসভায় দাবী করেছে ভারতে ৬০ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলমান এসেছে, এদের বিতাড়ন করা চলবে না। এদের অবিলম্বে নাগরিকত্ব দিতে হবে। বিশ্বের যে কোনো দেশে অনুপ্রবেশকারীর শাস্তি মৃত্যু। এখানে ওঠে তাদের জন্য নাগরিকত্বের দাবী। আলেকজাণ্ডার এ দৃশ্য দেখলে ডায়লগ হারিয়ে শুধু সেলুকাসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। ১৪ই জানুয়ারীর মিটিং-এ আরো একটি দাবী তুলেছে মসুলীম নেতারা। ১৯৪৭ সালে যে ত্রিশ হাজার হিন্দু পাকিস্তান থেকে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিল কাশ্মীরে, কাশ্মীরকে হিন্দুস্তান মনে করে তাদের সংখ্যা এখন সত্তর হাজার। আজ পর্যন্ত কোনো সরকার তাদের নাগরিকত্ব দেয়নি ওদের যেন কোনদিন নাগরিকত্ব না দেওয়া হয়। এইভাবে কাশ্মীরকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের লীলাভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। অনুপ্রবেশ বন্ধ না করলে ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ না করলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কোনোদিন হবে না। বি.জে.পি. ছাড়া একথা কিন্তু কেউ বলছে না। এদেশে নাকি দেশকে ভালোবাসেন এমন মুসলমান অনেক আছেন, তাদের কোনো আওয়াজ এ পর্য্যন্ত শোনা যায়নি।

এতে মুসলমানদের কোনো দোষ দেখি না। অর্দ্ধেক ভারতবর্ষকে তারা পাক করেছে, অর্থাৎ পবিত্র করেছে। বাকিটাকেই বা তারা নাপাক করে রাখবে কেন?

'দার উল হারব' থেকে তারা 'দার উল ইসলামে' পরিণত করবেই ভারতকে। আরবের টাকা আসছে, পাকিস্তান থেকে প্রেরণা আসছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে সুতরাং তারা তো এটা মওকা মনে করবেই। পাকিস্তান কায়েম করার পর তারা শ্লোগান দিতো ঃ হাঁসকে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান। অর্থাৎ হাসতে হাসতে পাকিস্তান নিয়েছি, লড়াই করে হিন্দুস্থান নিয়ে নেবো। এখন তারা বলে ঃ হাঁসকে লিয়া পাকিস্তান, ঘুঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্তান। হেসে হেসে পাকিস্তান নিয়েছি, অনুপ্রবেশ করে হিন্দুস্থান নিয়ে নেবো। অর্থাৎ যুদ্ধের আর দরকার হবে না। ভারতে গণতন্ত্র আছে, মাথা গুণতি ভোট। তাই সংখ্যার খেলায় ম্যাজিক দেখাতে চাইছে মুসলমানেরা। সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে সকলের অজ্ঞাতে পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে মাটি। মজার কথা এটা অজ্ঞাতে হচ্ছে না। এই পরিকল্পনা এই চক্রান্ত আজ প্রত্যেকটি হিন্দুকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং ক্রমশঃই তারা চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে উঠছে। অনেকে বলছেন ঃ আদর্শ মুসলীম রাষ্ট্রের অনুকরণে ভারতে গণতন্ত্রের বিলুপ্তি যদি ঘটানো যায় তখন কি হবে? এ ভাবার ক্ষমতা মুসলমানদের থাকলে তারা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে লজ্জা পেতো। মুসলমানদের আচরণ দেখে অতি বড়ো ধর্মনিরপেক্ষ পণ্ডিতেরাও বলছেন, সংবিধান সংশোধন করে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা উচিত। কোথাও ইস্রায়েল নিয়ে ইহুদীদের নিয়ে আলোচনা হলে প্রত্যেকটি হিন্দু যে ভাবে ইহুদীদের সমর্থন করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, এই লক্ষণটিও মুসলমানদের খুব সর্তকতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। দু' হাজার বছরের লাঞ্ছনা অত্যাচার থেকে শিক্ষা নিয়ে ইহুদীরা সংগঠিত হয়েছে। মাত্র উনত্রিশ লক্ষ ইহুদী বারো কোটি মুসলমানকে মাথা উঁচু করলেই মাথার চাঁটি মারছে। বিশ্ব মুসলীম ঐক্য মুসলীম বীরত্ব ফাটা বেলুনের মত চুপসে দিয়েছে একা ইস্রায়েল। তাসের ঘরের মতই আজ আরব ঐক্য চূর্ণ বিচূর্ণ। একটি মুসলীম দেশ অন্য মুসলীম দেশকে বিশ্বাস করে না। ইরান ইরাক লড়ে মরে যাচ্ছিল পরের কাছে ধার করা অস্ত্র নিয়ে। আপাততঃ

দম নিচ্ছে। মুসলমান কোথাও শান্তিতে বাস করতে পারে না। পৃথিবীতে সর্বাধিক নিরাপদে শান্তিতে আর স্বাধীনতার সঙ্গে আছে ভারতের মুসলমানেরা। কিন্তু এই অনুপ্রবেশ এই সন্দেহ অবিশ্বাস, আর গত হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের নির্মম স্মৃতি যদি পৃথিবীতে আর একটি ইহুদীতুল্য জাতির জন্ম দেয়, যাদের সংখ্যা সত্তর কোটির অধিক, তাহলে? এগুলো কল্পনা নয়, হাইপথেসিস নয়, ভয় দেখানও নয়। এগুলো বিজ্ঞানের সত্য। দুই আর দুইয়ে চারের মতো প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমতুল বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব সহজে বিনাযুদ্ধে ভারত বিজিত হবার নয়। ভারতের যুবশক্তি জনশক্তি এখনও মরে যায়নি। আসামের যুবশক্তি ক্ষমতা দখল করে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করছে। এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো এবং সংবাদপত্র চীৎকার করছে বাঙালী বিতাড়ন হচ্ছে। হিন্দু বাঙালী হলে এরা কোনদিন একটা শব্দ করে না। মরিচঝাঁপি থেকে কি অত্যাচার করে নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের তাড়ানো হল। আজ মরিচঝাঁপি ভরিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। সে ব্যাপারে সবাই নির্বাক। অ, গ, প, সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং কৌশলের সঙ্গে বিদেশী বিতাড়ন করছে। পশ্চিমবঙ্গেও একাজ নীরবে সুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রীতদাস রাজনৈতিক দল ছাড়াও দেশে বহু সংগঠন আছে। স্বার্থপর নেতা বুদ্ধিজীবী ছাড়াও আছে বিশাল সমাজ। যাদের নিদ্রা হরণ করেছে এই অনুপ্রবেশ। ব্যাপক অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ারূপে সোচ্চার সাংবাদিক, উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক কর্মী, সন্দিগ্ধ জনগণ দ্রুত সংগঠিত হচ্ছেন। হিন্দু সংগঠনের নিকটবর্তী হচ্ছেন। বিশাল হিন্দু সমাজ জাগ্রত হচ্ছে সচেতন হচ্ছে। সরকার নানা প্রতিরোধের বন্দোবস্ত করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়েছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সীমান্ত পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলেন। জ্যোতি বসু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বামফ্রন্টের সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মুসলীম অনুপ্রবেশ কারীদের তালিকা সংগ্রহ করছে। বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা সীমান্ত এলাকায় বহু অনুপ্রবেশকারীদের ধরে পুলিশের হাতে

তুলে দিচ্ছে। এই সঙ্গে জন সচেতনতা আর একটু দরকার। কম পয়সায় মজুর পেলে চুপচাপ তাকে কাজে না লাগিয়ে পুলিশে দেওয়া উচিত। কোনো পাড়ায় থাকলে চাপ সৃষ্টি করা উচিত। গণতন্ত্রের নিয়মই হচ্ছে জনগণ সচেতন হলে দল এবং নেতা ঠিক পথে আসবে। সবাই সচেতন হচ্ছে। সীমান্তে কড়া প্রহরা বসানো হচ্ছে। কিন্তু যদি দেখা যায় অনুপ্রবেশ অপ্রতিরোধ্য, তাহলে এই জাগ্রত এবং সংগঠিত জনমতকে বাংলাদেশ দখলের অনুকূলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একাত্তরের অভিজ্ঞতা বলে দিয়েছে, প্রকৃত যুদ্ধে বাংলাদেশ ভারতের কামানের একঘণ্টার খোরাকও নয়। মনে রাখতে হবে মাথা না থাকলে যেমন মাথা ব্যথা থাকে না তেমনি বাংলাদেশ না থাকলে অনুপ্রবেশের সমস্যাও থাকবে না। সুতরাং এটাও একটা সমাধান। এগুলো কোনো ব্যক্তির ক্রুদ্ধ উক্তি নয়। গোটা জাতির অভিব্যক্তি। চীন বাংলাদেশ পাকিস্তান যে ভাবে ভারতকে উত্যক্ত করে তুলছে তাতে ভারতের বেশীদিন বৃহন্নলা সেজে থাকবার উপায় নেই। অর্জুনরূপে তাকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পঞ্চাশ হাজার হিন্দুকে মেরে তাড়ানো হোলো। পাকিস্তানে বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির ধ্বংস। ভারত ভাগের পর ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়লো তিনগুণ। আর বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে হিন্দু ছিল তা নিধনে এবং বিতাড়নে প্রায় শেষ। বাংলাদেশে এখনও প্রায় দু কোটি হিন্দু। বাংলাদেশের সেন্সাস একথা বলে না। কম করে দেখায়। উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা। যারা আছে অনিশ্চয়তায় যন্ত্রণায় অত্যাচারে ভয়ে কন্টকিত। অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় শুধু খুলনাতেই মন্দির ভেঙেছে পঞ্চাশটা। এখানে জামাই আদরে রাখার পরও একটি বিশেষ বংশের প্রিয়দাস মন্ত্রী থাকাকালীন বলেছিল, বামফ্রন্ট সরকার মুসলমানদের একটা চাকরী দেয় না। এত তেল দেবার পরও রাষ্ট্রসংঘে অভিযোগ করেছে আব্দুল্লা বোখারী। ভারতে ইসলাম বিপন্ন। আমরা অত্যাচারিত। ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতবর্ষ মুসলীম নিধনের সুপরিকল্পিত কসাইখানা। চাকুরী ব্যবসা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানেরা বঞ্চিত। ধর্মের কোন স্বাধীনতা নেই, মুসলীম নারীর সম্মান ভুলুণ্ঠিত।

কয়েকটি স্বার্থপর মুসলমানকে উচ্চপদে রেখে দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে এই সরকার। সর্বতোভাবে ভারতের মুসলীম সমাজ অত্যাচার অবিচারের শিকার। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বাধীনতা ভোগকারী এবং ভারতের হিন্দুদের তুলনায় অধিক সুযোগের অধিকারী মুসলীম সমাজ রাষ্ট্রসংঘে আবেদন জানিয়ে ভারতকে জগতের সামনে কলংকিত করলো। মুসলমানদের আচরণ বক্তব্য গোটা হিন্দু জাতির রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। যে ঘটনা তারা ভুলতে চেষ্টা করেছে তাদের সেকথা খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে হিন্দুর সঙ্গে তাকলে মুসলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি কিছু থাকবে না, তারা বঞ্চিত হবে লাঞ্ছিত হবে, এই বিশ্বাস থেকেই তারা ভারত ভাগ করে নিজেদের দেশ বুঝে নিয়েছে। আজ মিথ্যে বঞ্চনার কাঁদুনি গাওয়া কেন? নিজেদের দেশে চলে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের হাতেই আছে। অত্যাচার সহ্য করার প্রয়োজন কোথায়? মনে রাখা প্রয়োজন অন্যায় আব্দারের একটা সীমা আছে। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় হিন্দুনিধন বিতাড়নের ঘটনা কোনো হিন্দু ভোলেনি। চোদ্দ পুরুষের জন্মভিটের স্মৃতি অত সহজে ভোলা যায় না। ভোলা যায় না আত্মীয় হত্যা আর মা বোন হারানোর চোখে দেখা ঘটনা। এছাড়া আমাদের চোখের সামনে রয়েছে হাজার বছরের ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত রক্তাক্ত মুসলীম ইতিহাস। মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির বৃত্তান্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেশে। রয়েছে ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায় চৌধুরীর রচনায়। হত্যা খুন নারীহরণ জোর করে ধর্মান্তরিত করা ছিল প্রতিদিনের দিনচর্যা। শুধু ইতিহাসের রূপকথাই নয় সাম্প্রতিককালের অপরূপকথা ওই একই শব্দ দিয়ে তৈরি। জন্মভূমি ভারতবর্ষকে দুটুকরো করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। হত্যা খুন লুঠ নারীর সতীত্বনাশ। সব কেড়ে নিয়ে হিন্দুস্থানে তাড়িয়ে দেওয়া। এই তাড়িয়ে দেওয়ার পরস্পরা আজও অব্যাহত। ওপার থেকে পালিয়ে আসা ইলারাণী বিশ্বাসদের বিবরণ পড়তে হচ্ছে যুগান্তরের পাতায়ঃ আমার স্বামীকে বেঁধে রেখে ওরা আমাকে একে একে ধর্ষণ করলো। এর চেয়েও জঘন্য নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ হাজার হাজার মানুষ লিপিবদ্ধ করাচ্ছে চোখের জল ফেলত ফেলতে।

বর্ডারে বর্ডারে বি, এল, ও, অফিসের রেজিষ্টারে। সভ্য মানুষ আঁতকে উঠবে সে কাহিনী শুনে। এ বিষয়ে ভারতের মুসলীম সমাজ নির্বাক। নীরব সমর্থক। তাদের কাছ হচ্ছে আবার ভারতে বসে একই পদ্ধতিতে নতুন পাকিস্তান তৈরির চেষ্টা করা। আর হিন্দুরা শুধু চেষ্টা করে যাবে হিন্দু মুসলীম ঐক্য বজায় রাখার, ধর্মনিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন রাখার। মুসলীম সমাজেরই একবার ভাবা উচিত হিন্দুরা ধৈর্য্যের সহিষ্ণুতার আর কতো পরীক্ষা দেবে? হিন্দুদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। নিঃশব্দে দেশব্যাপী হিন্দুসমাজ জাগ্রত হচ্ছে। চারিদিকের আস্ফালন ও কিছু নয়। রাষ্ট্রদ্রোহীদের হিন্দু বিরোধীদের অন্তিম চীৎকার। চীনের বিখ্যাত দার্শনিক লাওৎসে বলেছেন ঃ যাকে দুর্বল কোরবে তাকে বলবান হোতে দাও। যাকে একেবারে চুপ করাতে হবে তাকে বাচাল হোতে দাও যাকে মাটিতে শোয়াতে হবে তাকে আকাশে উঠতে দাও।।
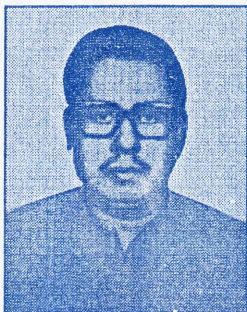
শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা